একক ২ ❐ গ্রন্থাগার সংগঠন—পরিকাঠামো

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা
২.২ সংগঠন—গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য
২.৩ সংগঠন কাঠামো—রচনা
২.৪ সংগঠন—মূলনীতি
২.৫ সংগঠন—প্রকারভেদ
২.৬ গ্রন্থাগার সংগঠনের চিত্র
২.৭ ব্যবস্থাপনা, সংগঠন ও প্রশাসন : তুলনা
২.৮ অনুশীলনী
২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ প্রস্তাবনা

সংগঠন তৈরির অর্থ বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে উপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপন করা, যাতে তারা দক্ষতার সাথে মিলে-মিশে কাজ করতে পারে, এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য দক্ষতাকে ব্যবহার করতে পারে। সংগঠনের মাধ্যমে গৃহীত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামো তৈরি করা। এখানে সংগঠনের বিভিন্ন দিক, বিশেষত পরিকাঠামো নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হয়েছে, এবং গ্রন্থাগার সংগঠনের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

২.২ সংগঠন—গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য

কোনো সংস্থার সংগঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। সংগঠন তৈরির প্রক্রিয়ায় একই ধরনের কাজগুলিকে একত্রে রেখে সমস্ত কাজের শ্রেণিবিভাগ করা হয়, ফলে কোনো কর্মী প্রতিনিয়ত সেই কাজ করার ফলে তাতে দক্ষ হয়ে ওঠে। সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে তাই সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক কাজের দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব হয়। এছাড়া কাজের এই শ্রেণিবিভাগের জন্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সুনির্দিষ্টকরণ সম্ভব হয় ও কোনোপ্রকার পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে না। সংগঠন তৈরির কাজ মূলত বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে করা হয়। তাই এখানে সমন্বয় বা সংযোগ গড়ে ওঠে, এবং তা যে-কোনো সংস্থার পক্ষেই কাম্য। সংগঠন হল ব্যবস্থাপনার মূল স্তম্ভ। সংগঠন কোনো সংস্থার ভবিষ্যৎ কর্মসূচিকে প্রাণবন্ত রূপ এনে দেয়। সংগঠন সংযোজনাও শৃঙ্খলার হাতিয়ার। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পদ ও স্তরের মধ্যে অভিন্নতা সৃষ্টির জন্য সমন্বয় প্রয়োজন এবং সংগঠন ওই সমন্বয় সাধন করে।

বি. জে. হোজ (B. J. Hodge) এবং এইচ. জে. জনসন (H. J. Johnson) বলেছেন সাতটি উপাদানের সমন্বয়ে সংগঠন গঠিত। ওই সাতটি উপাদান হল—(i) উদ্দেশ্য, (ii) কর্মভিত্তিক বিভাগ, (iii) সদস্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠী, (iv) নীতি ও পদ্ধতি, (v) বাস্তব সম্পদ, (vi) ক্ষমতা এবং (vii) যোগাযোগের পথ। চেষ্টার আই. বার্নাড (Chester I. Barnard), সংগঠনের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—(i) সাধারণ লক্ষ্য, (ii) যোগাযোগ এবং (iii) সেবার মনোভাব। তাই সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে-কোনো ভালো সংগঠনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি

হল—(১) উদ্দেশ্যমুখীনতা (Objectivity), (২) কাজের সুষম বণ্টন (even distribution of work), (৩) কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের প্রবাহ (flow of authority and responsibility), (৪) আদেশের একতা (Unity of command), (৫) ভারসাম্যতা (stability), (৬) সরলতা (simplicity), (৭) পরিবর্তনশীলতা (flexibility), (৮) নিয়ন্ত্রণের পরিধি (span of control), (৯) সমন্বয়সাধন (coordination), এবং (১০) ব্যয়সংক্ষেপ (economy)।

এগুলিকে আমরা বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য থাকে এবং সংগঠন উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম। প্রত্যেকটি কর্মকে বিভিন্ন বিভাগ এবং উপবিভাগে বিভক্ত করার পর প্রত্যেক উপবিভাগের কর্মীদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়। কর্মীদের কাজের দায়িত্ব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন—যার অভাবে কর্মসম্পাদন অসম্ভব। একজন কর্মী কেবলমাত্র একজন ঊর্ধ্বতন কর্মীর থেকেই কাজের দায়িত্ব পান ; একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মীর কাছ থেকে নয়। বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটি ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্টি করে সংগঠন কাজের প্রবাহকে গতিময় ও মসৃণ করে তোলে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক পরিবর্তন যাতে খাপ খাওয়াতে পারে, তার জন্য সংগঠনে প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন প্রয়োজন। অর্থাৎ সংগঠন কোনো অপরিবর্তিত ব্যবস্থা নয়, এটিও পরিবর্তনশীল। সংগঠনের সরলতা অবশ্যই কাম্য। একটি সরল সংগঠন থেকে কর্মীরা সহজেই তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের কাঠামো থেকে নিয়ন্ত্রণের পরিধি জানা যায়। প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের পরিধি জানানো সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সংগঠন প্রতিষ্ঠানের ভৌত, আর্থিক, কর্মী ইত্যাদি সম্পদগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তোলে। ব্যয়ের হ্রাস সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন সম্পদের উত্তম ও উপযুক্ত ব্যবহার, কাজের প্রবাহকে গতিশীল করা, কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে অপচয় রোধ করা, ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হ্রাস করা একমাত্র সংগঠনের পক্ষেই সম্ভব।

২.৩ সংগঠন কাঠামো—রচনা

সংগঠন তৈরি একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় কতকগুলি ধাপ আছে। এই ধাপগুলি ঠিকমতন অনুসরণ করলেই সংগঠন তৈরির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

প্রথম ধাপ—উদ্দেশ্য নির্ধারণ—কোনো প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক পরিকাঠামো সবসময়ই সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করাই সংগঠন কাঠামো রচনার প্রথম ধাপ।

দ্বিতীয় ধাপ—বিভিন্ন কাজের চিহ্নিতকরণ—প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নির্ধারণের পরে সংগঠন তৈরীর প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ হল নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি সফল করার জন্য যে সফল কার্যাবলী সম্পাদন করা প্রয়োজন, সেগুলি চিহ্নিত করা।

তৃতীয় ধাপ—একই ধরনের কাজের একত্রীকরণ—এই ধাপে একই ধরনের কাজগুলিকে একটি নির্দিষ্ট বিভাগের অধীনে আনার ব্যবস্থা করা হয়, যাতে সেগুলি সুষ্ঠুভাবে এবং অধিক পারদর্শিতার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

চতুর্থ ধাপ—কাজের দায়িত্ববণ্টন—বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিভাগকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয় ; এবং বিভাগীয় প্রধান কাজের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কাজগুলিকে ভাগ করে দেন। সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক কাজের দায়িত্ব দেওয়াটাই এই ধাপের মূল উদ্দেশ্য।

পঞ্চম ধাপ—কর্তৃত্ব অর্পণ—কাজের উপযুক্ত কর্তৃত্ব না থাকলে কোনো ব্যক্তিই কাজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার মানসিকতা অর্জন করতে পারে না। ব্যক্তিবর্গের কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য এই কর্তৃত্ব অর্পণ অত্যন্ত জরুরী।

উল্লিখিত পাঁচটি ধাপ বা স্তরের মধ্যে দিয়েই সংগঠন তৈরীর প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে হয়। সংগঠন স্পন্দন, ও চলন চালন অনুভব করা যায়। প্রক্রিয়ার এই পাঁচটি ধাপের প্রতিটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিটি ধাপই প্রতিটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে-কোনো একটি ধাপের অবহেলায় সংগঠন তৈরির প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

প্রশাসন—প্রতিষ্ঠানের কর্মের চরিত্র দুই প্রকারের—চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবে ওই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ। প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরে যাঁরা অবস্থান করেন, প্রতিষ্ঠানের মৌলিক সিদ্ধান্ত তাঁরাই নিয়ে থাকেন ; এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকেই প্রশাসন বলে। সিদ্ধান্ত রূপায়ণের সাথে যারা জড়িত থাকে, তাদের বলা হয় ব্যবস্থাপক। জে. উইলিয়াম সুলজ্ (J. William Schulze) প্রশাসনের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন— "প্রশাসন হল প্রতিষ্ঠানের সেই শক্তি, যা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও মৌলিক নীতিগুলি স্থির করা, এবং নীতিগুলি পরিসীমার মধ্যে থেকে ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। প্রশাসন মূলত নির্দেশাত্মক, অর্থাৎ এর মধ্যে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশদানের বিষয়টি থাকে।

সাংগঠনিক পরিকাঠামোর উপর তিনটি উপাদান অনেক সময়ই প্রভাব বিস্তার করে—সেগুলি হল—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও জটিলতা।

পি. এফ. ড্রাকার (P. F. Drucker)-এর মতে কোনো কারবারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ঠিক কী ধরনের কাঠামো প্রয়োজন সেই বিষয় নির্ধারণ করার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে।

কার্যাবলীর বিশ্লেষণ—যে পদ্ধতিতে সংগঠনের মূল কাজ এবং ওই কাজের আনুষঙ্গিক কাজগুলি সনাক্ত করা হয় ;

সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ—যে পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়—যেমন, কোন্ কাজ সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে ইত্যাদি।

সম্পর্ক বিশ্লেষণ—উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যকলাপকে বিভাজন ও শ্রেণিবদ্ধকরণের পরে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কর্মীর উপর কার্য সম্পাদনের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৪ সংগঠন—মূলনীতি

আধুনিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সংগঠন। সংগঠন কিছু কিছু নীতি অনুযায়ী গঠিত হয়। সেই নীতিগুলি নীচে আলোচনা করা হল—

(i) **উদ্দেশ্যর সামঞ্জস্য সংক্রান্ত নীতি** (Principle of Unity of Objectives)—কোনো সংগঠনের সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কর্মীদের অবদান অসামান্য। কোনো সুষ্ঠু সংগঠনের বিভিন্ন স্তর বা বিভাগ অথবা উপবিভাগে অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে এক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ii) **বিশিষ্টতা সংক্রান্ত নীতি** (Principle of Specialisation)—এই নীতি অনুযায়ী কোনো সংস্থার উন্নতির জন্য সেই সংস্থার বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সংস্থার বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

(iii) **সরলতা সংক্রান্ত নীতি** (Principle of Simplicity)—সংগঠনটি যথাসম্ভব সরল হওয়া প্রয়োজন এবং পরিকাঠামোটিও যথাসম্ভব সহজ সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(iv) **নমনীয়তা সংক্রান্ত নীতি** (Principle of Flexibility)—সংস্থাটিকে নমনীয় হতে হবে ; সময়ের সঙ্গো সঙ্গো বিভিন্ন ধরনের অবস্থায় মানানসই হতে হবে, এবং যুগোপযোগী সম্প্রসারণ বা সংকোচন করার ক্ষমতা থাকতে হবে। বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গো অভিযোজিত না হলে সংস্থার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

(v) **ভারসাম্য** (Principle of Balance)—বিভিন্ন ধরনের বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে ; কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার এবং নানাবিধ উপাদান, প্রযুক্তি, কর্মী অর্থ ইত্যাদির মধ্যেও সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(vi) **নিয়ন্ত্রণের সীমাবদ্ধতা** (Principle of Limited Span of Control)—মুখ্য কর্মনির্বাহকের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে অধিকসংখ্যক বিভাগ না থাকাই ভালো, কেননা একজন ব্যবস্থাপকের পক্ষে অধিকসংখ্যক অধস্তন কর্মচারীদের দক্ষতার সঙ্গো নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

(vii) **স্তরানুক্রমিক ক্ষমতা** (Principle of Scalar Authority)—সুষ্ঠু সংগঠনের বৈশিষ্ট্য স্তরানুক্রমিক ক্ষমতা। কর্তৃত্ব উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরে পর্যায়ক্রমে নেমে আসে এবং নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে ধাপে ধাপে প্রতিবেদন পেশ হয়।

(viii) **আদেশের একতা** (Unity of Command)—কাজের একতা রক্ষা করার জন্য আদেশের একতা প্রয়োজন। কোনো অধস্তন কর্মীকে একজন মাত্র ঊর্ধ্বতন কর্মী আদেশ দেবেন, এবং প্রতিটি অধস্তন কর্মী একজন মাত্র ঊর্ধ্বতন কর্মীর কাছে কৈফিয়ৎ দেবেন।

(ix) **কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব অর্পণ** (Delegation of Authority and Responsibility)—কর্তৃত্ব অর্পণের উপর ভিত্তি করেই সংগঠনের সামগ্রিক কার্যকলাপ পরিচালিত হয়। অধস্তন কর্মচারীগণ যাতে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন, সেজন্য ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের উচিত তাদের উপরে যথাযথ কর্তৃত্ব অর্পণ করা। কর্তৃত্ব অর্পণের গুরুত্ব এইভাবে বোঝা যায়—ব্যবস্থাপকদের কাজের বোঝা লাঘব হয়, ব্যবস্থাপক কর্মচারীদের মধ্য সুসম্পর্ক তৈরি হয়, ব্যবস্থাপনার এবং ব্যবস্থাপকদের দক্ষতার উন্নতি হয় এবং সর্বোপরি এর দ্বারা অধস্তন কর্মচারীরা অনুপ্রাণিত হয়।

(x) **রৈখির ও কর্মী সংক্রান্ত কর্তৃত্ব** (Line and Staff Authority)—রেখা অর্থাৎ কর্তৃত্ব এবং কর্মী সংক্রান্ত কর্তৃত্ব যে-কোনো সংগঠনের মূল স্তম্ভ। রেখা ও কর্মী ধাঁচের সংগঠনের কর্তৃত্ব ও পরামর্শ সুসমন্বিত। রৈখিক কর্তৃত্ব সংক্রান্ত কার্যাবলী মূলত সাংগঠনিক উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার সঙ্গো যুক্ত থাকে। এই ধরনের কার্যাবলীর ধরন এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

(xi) **কার্যভিত্তিক কর্তৃত্ব** (Functional Authority)—এফ. এইচ. টেলরের অবদান হিসাবে এই পদ্ধতি স্বীকৃত। রেখা-ধাঁচ বা রেখা-কর্মীধাঁচ সংগঠনের প্রায়শই সমন্বয়ের অভাবে সমস্যার জন্ম দেয়। কাজেই এমন কোনো উপায় থাকা দরকার যার ভিত্তি হল কাজ। প্রথমেই যদি প্রত্যেকের কর্তব্যের সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং তা যদি করা যায় কাজের স্বরূপ অনুযায়ী তা হলে একই কাজ দুই বিভাগে দুবার করার দরকার হয় না।

(xii) **কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ** (Centralised Control)—সাফল্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কাজে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কোনো সুষ্ঠু সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ।

(xiii) **সমন্বয়** (Coordination and Integration)—কোনো সংস্থায় সমন্বয় স্থাপিত হলে কর্মপ্রবাহ মসৃণ হয় এবং আন্তর্বিভাগীয় দ্বন্দ্ব পরিহার করা সম্ভব হয়। প্রতিষ্ঠানের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় সেজন্য সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সংহতি প্রক্রিয়ায় বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্তির অবলুপ্তি ঘটে।

২.৫ সংগঠন—প্রকারভেদ

প্রকৃতির দিক দিয়ে সাংগঠনিক পরিকাঠামো দুই ধরনের হতে পারে—নিয়মমাফিক সংগঠন (Formal Organisation) এবং অনিয়মমাফিক সংগঠন (Informal Organisation)।

নিয়মমাফিক সংগঠন—কোনো সংগঠনের পরিকাঠামো যখন নির্ধারিত কার্যকলাপ ও সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, তখন তাকে নিয়মমাফিক সংগঠন বলে। স্কট বলেছেন—"নিয়মমাফিক সংগঠন হল একটি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় একদল মানুষ দলবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য সফলের আশায় নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ভিত্তিতে কাজ করে।" নিয়মমাফিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে খুব চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পনা করা হয় এবং এখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোনো স্থান নেই।

অনিয়মমাফিক সংগঠন—অনেক সময় মানুষের মধ্যে নিয়মমাফিক সম্পর্কের বাইরেও একটি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাকে অনিয়মমাফিক সংগঠন বলে। এই সংগঠন কোনোরূপ নিয়মনীতির উপর ভিত্তি না করে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই ধরনের সংগঠনের সদস্যরা একে অন্যকে উপদেশ দেন। এই ধরনের সংগঠন তৈরির জন্য কোনো বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় না ; এর কোনোরূপ সাংগঠনিক নকশা ও ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই ধরনের সংগঠনের সৃষ্টি হয়।

এছাড়া প্রশাসনিক সংগঠন অন্যরকমভাবে বিভাজন করা যায়—যেমন রৈখিক সংগঠন (Line Organization), রৈখিক ও কর্মভিত্তিক সংগঠন (Line & Staff Organisation), এবং কার্যভিত্তিক সংগঠন (Functional Organization)।

রৈখিক সংগঠন—সকল কর্মীকেই যখন সরাসরি মুখ্য প্রশাসকের কাছে কাজের জন্য দায়ী থাকতে হয়, তখনই তাকে রেখাধাঁচের সংগঠন বলে। এখানে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের মধ্যে পরিষ্কার বিভাজন দেখা যায়। এখান কর্তৃত্ব অর্পণ সর্বদাই ব্যবস্থাপনার উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং দায়িত্ব পালন ব্যবস্থাপনা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরের দিকে সঞ্চালিত হয়। এই ধরনের সংগঠনের পরিকাঠামো খুবই সরল প্রকৃতির হয়।

রৈখিক ও কর্মী সংক্রান্ত সংগঠন—এই সংগঠনে রৈখিক কর্তৃত্ব ও কর্মী সংক্রান্ত কর্তৃত্ব একই সঙ্গে বজায় থাকে। প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ থেকে পৃথক এমন কতকগুলি সহায়ক কার্যাবলীর জন্য আলাদা বিভাগ তৈরি করা হয় এবং সেই বিভাগগুলিকে মূল কার্যকলাপ থেকে আলাদা করে দেখা হয়। এখানে কর্তৃত্ব ও পরামর্শ সুসমন্বিত।

কার্যভিত্তিক সংগঠন—এই ধরনের সংগঠনের রৈখিক কর্তৃত্ব ও কর্মী সংক্রান্ত কর্তৃত্ব ছাড়াও কার্যঘটিত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয়। এই ধরনের সংগঠনে পরিকাঠামোটি তুলনামূলকভাবে জটিল। এখানে কর্মীসংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে ব্যবস্থাপকদের কাজের চাপের নির্দিষ্ট কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে না। এই ধরনের সংগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপকদের ব্যবস্থা করতে হয়, তাই এতে ব্যয়ও অধিক।

২.৬ গ্রন্থাগার সংগঠনের চিত্র

গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ; তাই অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতনই এর সাংগঠনিক চিত্রটি ফুটে ওঠে। লাইব্রেরির লক্ষ্য হল পাঠ্যদ্রব্যের অধিকতম ব্যবহার ন্যূনতম ব্যয়ে। গ্রন্থাগারিককে এখানে বিশ্বাস এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার মূলনীতি সম্বন্ধে বোদ্ধাও হতে হয়। কোনো গ্রন্থাগারে যদি রেখাধাঁচের সংগঠনের পরিকাঠামো অনুসরণ করা হয়, তবে তার চিত্র এইরূপ হয়—

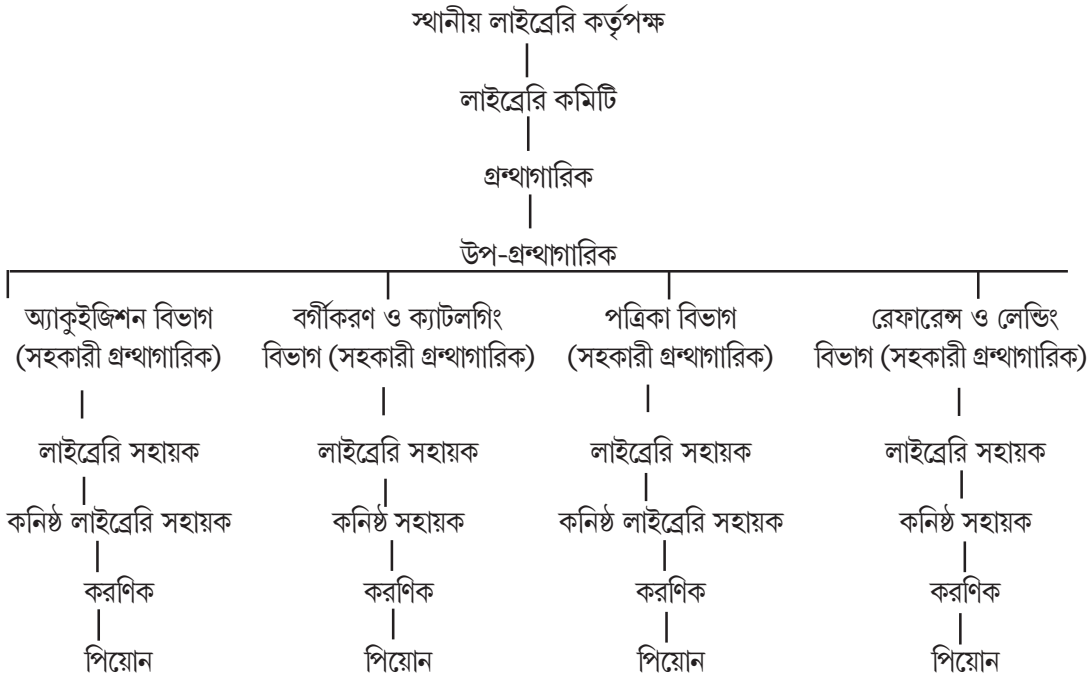

যদি কোনো গ্রন্থাগারে রেখা এবং কর্মী ধাঁচের সাংগঠনিক পরিকাঠামো অনুসরণ করা হয়, তবে তার চিত্রটি এইরূপ হয়—

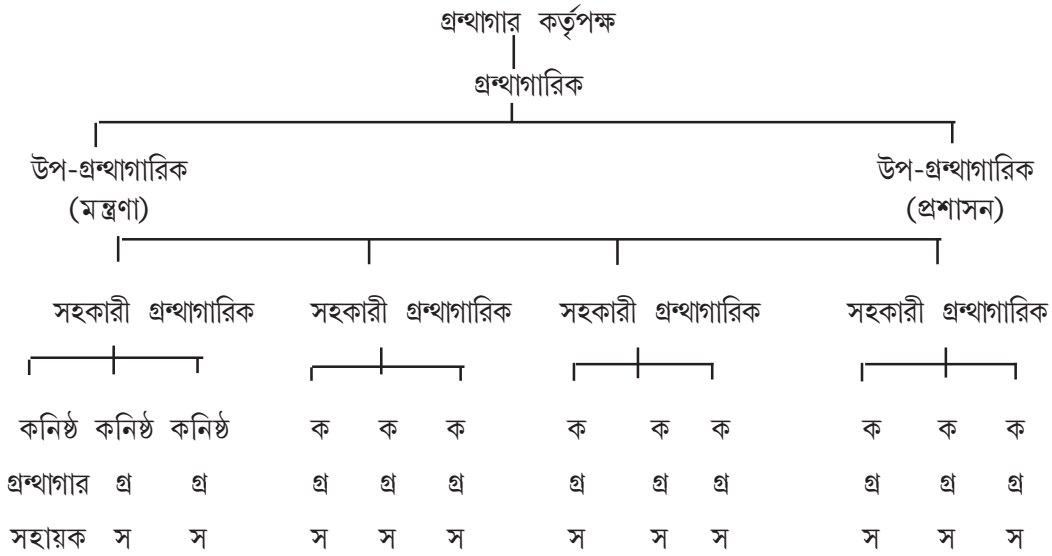

কিন্তু কোনো গ্রন্থাগারেই নির্দিষ্টভাবে কোনো ভাগ করা যায় না। সমস্ত প্রক্রিয়ারই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। তবু একথা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় যে প্রক্রিয়াতেই গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা যাক না কেন, সর্বদাই পূর্বে উল্লিখিত সাধারণ নীতিগুলি অনুসরণ করা হয়। এবার আমরা চিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের পরিকাঠামোর চিত্রগুলি তুলে ধরব।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সিন্ডিকেট/এক্জিকিউটিভ কাউন্সিল

ভাইস চ্যান্সেলার

লাইব্রেরি কমিটি

লাইব্রেরিয়ান

- ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান (সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট)
  - রেফা ডিপার্ট সহ গ্রন্থাগারিক
  - লেন্ডিং ডিপার্ট সহ গ্রঃ
  - বিভাগীয় গ্রন্থাগার সহঃ গ্রঃ
  - বিশেষ সংগ্রহ সহঃ গ্রঃ
- অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার (এস্টাবলিশমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ব্রাঞ্চ
- ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান (টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট)
  - অ্যাকু ডিপার্ট সহঃ গ্রঃ
  - টেক ডিপার্ট সহঃ গ্রঃ
  - বাইন্ডিং সহঃ গ্রঃ
  - ডকুমেন্টশন রিপ্রোডাক্শন
  - ডকুমেন্টারি

বিশেষ গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগারিক—গ্রন্থাগার সমিতি

কারিগরি বিভাগ
- অ্যাকুইজিশন
  - i. ক্রয়
  - ii. বিনিময়
  - iii. উপহার
- বর্গীকরণ
- ক্যাটলিগিং

গ্রন্থপঞ্জি
বিষয়
অনুসন্ধান

গ্রাহক পরিষেবা
- সার্কুলেশন
- ক্যাস্
- এস.ডি.আই
- সূচীকরণ—ও সার তৈরি
- অনুবাদ
- কম্প্যুটার ভিত্তিক তথ্য সরবরাহ

মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মুখ্য গ্রন্থাগারিক

কারিগরি বিভাগ
- অ্যাকুইজিশেন
- নির্দিষ্ট নিয়মমাফিক
  - বর্গীকরণ
  - ক্যাটালগিং

গ্রন্থাগার সমিতি

গ্রন্থাগার ও ডকুমেন্টশন সেবা

i. রেফারেন্স সেবা

ii. সার্কুলেশন

iii. গ্রন্থপঞ্জি

iv. তথ্য সন্ধান

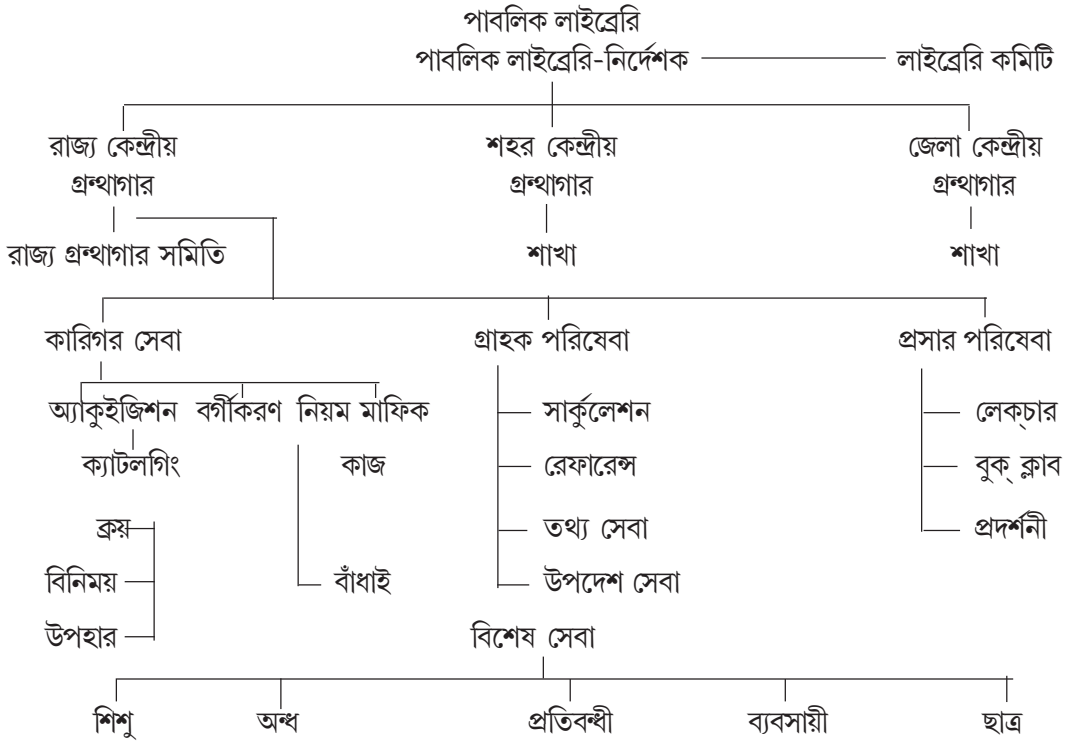

২.৭ ব্যবস্থাপনা, সংগঠন ও প্রশাসন : তুলনা

ব্যবস্থাপনা, সংগঠন ও প্রশাসনের মধ্যে অনেকসময়ই তুলনা এসে যায় কারণ তিনটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ব্যবস্থাপনা : প্রতিষ্ঠানের পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠানের মানবিক ও অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশলকেই ব্যবস্থাপনা বলে। ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের এমন এক কাজ যা সম্পদের কাম্য ব্যবহার সুনিশ্চিত করে, স্বল্প ব্যয়ে অধিক দক্ষতার সাথে কর্মসম্পদের ব্যবস্থা করে ও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য পূরণ করে। তাই ব্যবস্থাপনাকে উৎপাদনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ যতই হোক্ না কেন, প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ব্যবস্থাপনা না থাকলে প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারে না।

সংগঠন : কর্মী, কর্মপরিবেশ ও কাজের উপকরণের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনকে সংগঠন বলা হয়। বস্তুত প্রতিষ্ঠানের সংগঠন হল সেই পরিকাঠামো যার মধ্যে দিয়ে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের প্রবাহ উলম্বভাবে যথাক্রমে উপর থেকে নীচের দিকে ও নীচের থেকে উপর দিকে প্রবাহিত হয়। সংগঠনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মী তার অবস্থান, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করে। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যেসব কার্যকলাপ গ্রহণ করা হয় তাদের সাফল্যের সাথে সম্পাদনের নেপথ্যে সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা সংগঠনের। তাই বলা হয়, সংগঠন এমন এক কাল্পনিক কাঠামো যা বিভিন্ন কর্ম ও কর্মীর মধ্যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা বণ্টন করে, ও সেগুলির সম্পাদন সুনিশ্চিত করে। সংগঠনহীন প্রতিষ্ঠান কখনোই তার উদ্দেশ্য সাধন করতে সমর্থ হয় না। তাই বলা হয় যে সংগঠনের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের নাড়ির গতি, হৃদয়ের।

২.৮ অনুশীলনী

১। সংগঠন কাকে বলে ? এর বৈশিষ্ট্য কী ?

২। সংগঠনের মূলনীতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। সংগঠন কাঠামো রচনার পদ্ধতিটি আলোচনা করুন।

৪। সংগঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপগুলি উল্লেখ করুন।

৫। রৈখিক সংগঠন বলতে কী বোঝেন ? কর্মী সংগঠনের সঙ্গে রৈখিক সংগঠনের পার্থক্য কী ?

৬। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের সংগঠনের চিত্রটি তুলে ব্যাখ্যা করুন।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. বিলাস কুমার বিশ্বাস—আধুনিক ব্যবস্থাপনা, ১৯৯৭

২. পি. কে. মহাপাত্র ও শতদ্রুশোভন চক্রবর্তী—গ্রন্থাগার প্রশাসন, ১৯৯৩

৩. শ্যামলেশ মাইতি—ব্যবস্থাপনার নীতি ও উদ্যোগ

৪. সঞ্জীব কুমার বসু—কারবার ব্যবস্থাপনা, ২০০৩

৫. সুশীলকুমার গুপ্ত—গ্রন্থাগার প্রশাসন, ১৯৮৯

৬. বিশ্বজিৎ ভদ্র ও অশোক সৎপতি—কারবার ব্যবস্থাপনা, ২০০৫

৭. পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায়—কারবার ব্যবস্থাপনার রূপরেখা, ২০০৪